মূর্তি নির্মাণে শাস্ত্রীয় বিধান

ভাস্কর শ্যামল সমাজপতি

১লা জুলাই ২০০৯ ভাগ্যফল পত্রিকায় প্রকাশিত

প্রথমেই বলে রাখি আমি শিল্পী (ভাস্কর), মূর্তি নির্মাণ করি। ভাস্কর্য গুরুমুখী বিদ্যা, কাজের প্রয়োজনে কিছু বইপত্র ঘেটে পাওয়া শিক্ষা। এর পরে যোগ হয়েছে অভিজ্ঞতা। এখানে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে আমি কয়েকটি বিশেষ নিয়ম (শাস্ত্রমত) এবং মাধ্যমের কথা বলছি। এই মত বা নিয়ম কিন্তু মাটির প্রতিমা নির্মাণের জন্য কখনোই না, শুধুমাত্র ভাস্কর্যের জন্য প্রযোজ্য (ধাতু অথবা পাথর)। মনে রাখতে হবে প্রতিমা এবং ভাস্কর্য কিন্তু এক নয়।

প্রথম মানব কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ওম্ ধ্বনি। সেই ধ্বনি থেকেই হল শব্দ ওম্ তৎ সৎ। এর কোনও কারক - বিভক্তি নেই।

ওম্-প্রনবধ্বনি, তৎ-সেই, সৎ-ব্রহ্ম (অস্তিত্ব)। স্বর - এর সাথে যোগ হল সুর। এল সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য। সঙ্গীত, নৃত্য বা ভাস্কর্য, চিত্রকলা এগুলো সবক'টি হল পথ, লক্ষ্য হল মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছনো। এই পথ চলার জন্য কতকগুলি নির্ধারিত বিধান রয়েছে, আমি ভাস্কর্যবিদ্যার বিধানের মূল অংশ মাত্র বোঝানোর চেষ্টা করছি।

শিল্পকলা ভারতবর্ষের দর্শন ও ধর্মের সাথে শিরা-উপশিরার মতো যুক্ত হয়ে আছে। এখানে বহুমত আছে, সম্পূর্ণ মীমাংসা নাই তর্ক হতেই পারে।

'চিত্রলক্ষণ' নামক সংস্কৃত পুঁথিতে আছে ভয়জিৎ নামে এক রাজার রাজত্বে এক ব্রাহ্মণশিশুর মৃত্যু হয়। শিশুমৃত্যু রাজ্যের অমঙ্গলের লক্ষণ। সভাসদ ব্রাহ্মণগণ এই মৃত্যুর জন্য রাজাকে দায়ী করেন। ক্ষুব্ধ রাজা যুদ্ধে যমরাজকে পরাজিত করে বেঁধে রাখলেন। এদিকে ব্রহ্মা শুনে বিচলিত হয়ে ভয়জিৎ-এর কাছে এসে বললেন, এটা বিধির বিধান। তুমি যমরাজকে বন্ধনমুক্ত কর, নতুবা বিশ্বের পার্থিব ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। ভয়জিৎ শুনলেন না। তখন ব্রহ্মার নির্দেশে ভয়জিৎ ওই ব্রাহ্মণশিশুর একটি চিত্র অঙ্কন করলেন এবং ব্রহ্মা তাতে প্রাণ দান করলেন। এভাবে যমকে মুক্ত করলেন। 'চিত্রলক্ষণ' পুঁথির মত অনুযায়ী ভয়জিৎ প্রথম এবং আদি চিত্রশিল্পী।

'বিষ্ণুধর্মোত্তর' নামক শিল্পশাস্ত্রে পাওয়া যায়, কোনও এক সময়ে বিষ্ণু অবতাররূপী নারায়ণমুনি কঠিন তপস্যা শুরু করেন। তাতে দেবকূল বিচলিত হয়ে ওঠেন। তারা তাদের গতানুগতিক পথে সুরকন্যাদের পাঠালেন তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে। সুরকন্যাদের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে নারায়ণ মুনি অতীব এক সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কন করে তপস্যাস্থলের প্রবেশ পথে রেখে দিলেন। পরদিন সুরকন্যাগণের ওই চিত্রের রমণীকে দেখে নিজেদের রূপ ক্ষীণ বলে মনে হল, আর ওইপথে পা রাখলেন না। পরবর্তী সময়ে নারায়ণ মুনি ওই চিত্রে প্রাণ দান করে 'উর্বশী'তে পরিণত করে দেবকূলকে প্রদান করেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে নারায়ণ মুনিই হল চিত্রশিল্পের জনক। এছাড়া জৈন শাস্ত্রকার প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের আবার আরেক প্রকার মত রয়েছে।

আমাদের শাস্ত্রকার যে বিধান বা নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রধান অংশগুলো আমি উল্লেখ করছি। মাধ্যম, রস, তাল, (মূর্তির মাপ), মুদ্রা, অলংকার, আসন, বসন, এছাড়া বর্ণ এবং বাহন। বর্ণ এবং বাহন দুটো দেবতার ধ্যানের ও মধ্যে থাকে, তাই আমি এখানে উল্লেখ করছি না। কারণ একই দেবতার বিভিন্ন রূপে তার বর্ণ আলাদা হয়।

রস শিল্পশাস্ত্রে ৯ প্রকার রসের কথা বলা হয়েছে (নীচের ছকে দেখানো হল)।

রস	ভাব	বর্ণ	দেবতা
শৃঙ্গার	রতি	শ্যাম	বিষ্ণু
হাস্য	হাস্য(কৌতুক)	সিত	প্রমথ
করুণ	শোক	কপোত	যম
রৌদ্র	ক্রোধ	রক্ত	রূদ্র
বীর	উৎসাহ	গৌর	মহেন্দ্র
ভয়ানক	ভয়	কৃষ্ণ	কাল
বিভৎস	ঘৃণা	নীল	মহাকাল
অদ্ভুত	বিস্ময়	পীত	ব্রহ্মা
শান্ত	শম বা শান্তি	কুনেন্দুভাতি	নারায়ণ বা বুদ্ধরূপী জনার্দন

তাল	মূর্তিরূপের (তাল অর্থাৎ ভাগ মস্তক সর্বদা একভাগ ধরে নিতে হবে)। ৬ প্রকার তালের কথা বলা হয়েছে।
১৬ তাল	এই তালে নির্মাণ হয় দৈত্য অথবা অসুর। বৃত্তাসুর, রাবণ, হিরন্যকশিপু, রক্তবীজ, হিরনাক্ষ, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ ইত্যাদি।
১২ তাল	এই তালে নির্মাণ হয় যুদ্ধরত দেব-দেবী, ভৈরব, নরসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ অবতার, চন্ডী, কালিকা ইত্যাদি।
৯ তাল	এই তালের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঋষিমূর্তি এই তালে নির্মাণ করা হয়েছে।
৬ তাল	এই তালে নির্মাণ হয় কিশোর বয়সী মূর্তি। উমা, কিশোর কৃষ্ণ, বামনদেব, বলদেব ইত্যাদি।
৫ তাল	এই তালে নির্মাণ হয় শিশু মূর্তি।
	এখানে শাস্ত্রকার শিল্পীকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়ে বলেছেন প্রয়োজনে সাড়ে চার ভাগেও শিশুমূর্তি নির্মাণ করা যেতে পারে।

অর্থাৎ প্রথম ভাগে মস্তক, দ্বিতীয় ভাগে চিবুক থেকে জানু, বাকি অংশ মস্তকের আড়াইগুণ করে নির্মাণ করতে হবে। যেমন নাড়ুগোপাল বা ওই জাতীয় শিশুমূর্তি। যেখানে দুটো মূর্তি একসাথে নির্মাণ করতে হবে, সেখানে অবশ্যই দেবীমূর্তি ১ তাল ছোট করে নির্মাণ করতে হবে। যেমন হরপার্বতী, লক্ষ্মীনারায়ণ, ইন্দ্র-ইন্দ্রানী ইত্যাদি।

মাধ্যম ঃ

পাথর সাদা পাথর দিয়ে শিবলিঙ্গ ছাড়া সকল প্রকার মূর্তি নির্মাণ করা হয়। কালো, কালচে নীল,
কালচে সবুজ এই পাথরগুলোতে সকল প্রকার মূর্তি নির্মাণ করা যায়।

ধাতু ঃ পঞ্চধাতু, অষ্টধাতু এই মাধ্যমের কোথাও কোনও বিধিনিষেধ নেই।

পঞ্চধাতু ঃ তামা, লোহা, সীসা, সোনা রূপা।

অষ্টধাতু ঃ তামা, লোহা, সীসা, দস্তা, টিন, নিকোল (নিকেল), সোনা, রূপা।

মুদ্রা ঃ মুদ্রা হল শরীরের ভাষা। এই সম্পর্কে শিল্পীদের সব থেকে বেশি সচেতন থাকতে হয়। এটি নৃত্যের, ক্ষেত্রে যেমন, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুখমন্ডলের সাথে সঙ্গতি রেখে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মাণ করা উচিৎ। মুখমন্ডলের মধ্যে ভ্রূ, ওষ্ঠ, অধর, পুটম্ এগুলোর সাথে যেন মুদ্রা বিপরীতমুখী না হয়। আমাদের দেশের ভাস্কর্যের সাথে সঙ্গীত, নৃত্যের গভীর সংযোগ রয়েছে। তার অংশবিশেষ আমি উল্লেখ করছি। আমি প্রথমেই বলেছি ধ্বনি তার পর শব্দ সুর। এই সুরের উত্থান-পতন বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল 'সপ্তসুর' যথাক্রমে ষড়ভ, ঋ ষভ, গান্ধার, মাধ্যম, পঞ্চম, ধৈতব, নিষাদ, সংক্ষেপ করলে হল স-র-গ-ম-প-ধ-নি। এর অধপতি দেবতাগণ হলেন অগ্নি, ব্রহ্মা, সরস্বতী, শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য। সুরের উত্থান-পতন থেকে পাওয়া গেল তিনটি সুরগ্রাম যথাক্রমে উদারা, মুদারা, তারা। কথিত আছে নৃত্যকলার জনক হলেন শিব। নৃত্যকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। পুরুষ নৃতকে বলা হয়েছে তান্ডব আর নারীনৃত্যকে বলা হয়েছে লাস্য। নৃত্যের ছান্দিক ভঙ্গিকে বলা হয় ভঙ্গ। ভারতীয় ভাস্কর্যে ব্যবহৃত মুদ্রা ও নৃত্যে ব্যবহৃত মুদ্রা একই। এ জন্যই ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে জানতে হলে নৃত্যের কিছুটা জানা দরকার। ভাস্কর্য এবং নৃত্যে ব্যবহৃত মুদ্রাগুলোকে দুভাবে ভাগ করা হয়েছে যেমন সংযুক্ত মুদ্রা ও অসংযুক্ত মুদ্রা।

সংযুক্ত মুদ্রা ঃ অঞ্জলী, কপোত, কর্কট, শঙ্খ, চক্র, সম্পুট, কর্কটাবর্ধন, কর্তরীস্তুতিকা, শকট, স্বস্তিক, পুষ্পপুট, শিবলিঙ্গ, নাগবন্ধ, খট্টা, ভেরুণ্ড, কূর্ম, বরাহ, গরুড়, পাশ, কীলক, মৎস।

অসংযুক্ত মুদ্রাঃ মৃগশীর্ষ, সিংহমূল, কাঙ্গুল, অলপদ্ম, মুষ্টি, শিখর, কপিথ, কর্কটমুখ, সংস্থশ, মুকুল, তাম্রচূড়, ত্রিশুল, মথুর, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুন্ড, ব্র্যাঘ্র, উর্ননাভ, বান, পতাক, অর্ধপতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধসূচি, কটক, পল্লী, সূচি, চন্দ্রকলা, পদ্মকোষ, সর্পশীর্ষ, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, বরদ, অভয়।

ভঙ্গ বা ভঙ্গি লাস্য অথবা তান্ডব কোনওটাই ভঙ্গিকে যথাযথভাবে নির্মাণ না করলে মূর্ত্তি দৃষ্টিনন্দন হবে না। দুপায়ের ওপরে দেহের ওজন সমানভাবে রেখে দাঁড়ানো মূর্তিকে বলা হয় সমভঙ্গ বা সমপদ ভঙ্গ। সাধারণত বিষ্ণুমূর্তি এই ভঙ্গিতে নির্মাণ করতে হয়। এক পায়ের ওপর দেহের ভর রেখে অপর পা ভরমুক্ত করে বিশ্রামদান রত মূর্তিকে বলা হয় আভঙ্গ মূর্তি। সরস্বতী, লক্ষ্মী, সূর্য, বুদ্ধ ইত্যাদি মূর্তি আভঙ্গ মূর্তি। মাথা যেদিকে থাকবে কোমর থাকবে তার বিপরীত দিকে হেলানো, সেই মূর্তিকে বলা হয় ত্রিভঙ্গ মূর্তি।

সর্ববিধ ভঙ্গের বহির্ভূত আকৃতিই অতিভঙ্গ। এই ভঙ্গে তৈরি করা হয় কালীকা, চন্ডী, রমনভৈরব, নটরাজ।এই ভঙ্গিতে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তীব্র আবেগে পরিকম্পিত হয়, ধ্বংসলীলা বা অতিক্রোধ প্রকাশের জন্য এই ভঙ্গি বিশেষভাবে ব্যবহার্য। শিবের কাঁধে সতীর দেহ নিয়ে তান্ডব রত মূর্তি এর একটি উদাহরণ। এটি তান্ডবরত ভঙ্গি না হলে এই মূর্তিতে ছন্দপতন ঘটবে।

অলংকারঃ ভারতীয় ভাস্কর্যরীতিতে শাস্ত্রকার দেবদেবীকে অলংকার প্রদানে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই। সকল দেব-দেবীকেই মুকুট, রত্নহার, কেয়ূরকন্ডল, কবচ, মেখলা, নুপুর, টিকলি ইত্যাদি শুধুমাত্র শিবের ক্ষেত্রে রুদ্রাক্ষ নির্মিত মালা বা অলংকারের বিধান দিয়েছেন।

আসনঃ যেসকল বসা মূর্তি রয়েছে সেখানে বেশির ভাগ মূর্তিকেই পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বীরাসন, এই সকল আসনেরই বিধান রয়েছে।

বসনঃ দেবীমূর্তির ক্ষেত্রে বক্ষআভরণ কাপড় বা সকল প্রকার বস্ত্র পরিধানের বিধান দিয়েছেন। দেবমূর্তির জন্য পরিধেয় বস্ত্র এবং উত্তরীয় কেবলমাত্র শিব এবং কয়েকটি ভৈরবী মূর্তিতে ব্যাঘ্রচর্ম থাকবে। তাতে কোনও রত্নালং-কার থাকবে না। মস্তক হবে জটাধারী। অলংকার হবে রুদ্রাক্ষ নির্মিত।

মুখমন্ডল — সকল মূর্তির ক্ষেত্রে মুখমন্ডল একটি প্রধান অঙ্গ। এখানেই যত বিপত্তি ঘটে। এই কারণেই শাস্ত্রকার খুব সাবধানী হতে বলেছেন। এখানে রয়েছে ঠোঁট, নাক, চোখ, ভ্রূ। এগুলোকে ঠিকঠাক ভাবে না করলে মূর্তির ভাব ঠিক হয় না (মাটির প্রতিমার ক্ষেত্রে একই মুখ ছাঁচ থেকে তুলে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমায় ব্যবহার করে, সেই কারণে সেগুলো বেশির ভাগই প্রাণহীন বলে মনে হয়)।

ঠোঁট — এখানে দুটো ভাগ আছে। ওপরের অংশকে বলা হয় ওষ্ঠ, নীচের অংশকে বলা হয় অধর। মুখের ভাব প্রকাশের সহায়ক হিসেবে ওষ্ঠ অধরের সাথে সঙ্গতি রেখে যুক্ত না হলে কোনও ভাবের সৃষ্টি করা যায় না। বিরক্তি বা অনিচ্ছা প্রকাশের সময় ওষ্ঠ এবং অধর একইভাবে পরিবর্তন হয়, একদিকে বেঁকে থাকে। হাসিতে সামান্য প্রসারিত হয়। বালক বয়সী মূর্তির ক্ষেত্রে অধরের থেকে ওষ্ঠ সামান্য উঁচু হয়।

নাক বা নাসিকা — এই অংশটি মুখমন্ডলের মধ্যে সব চাইতে উঁচু। শাস্ত্রকার নাসিকাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তিলপুষ্পাকৃতি নাসিকা, শুকচঞ্চু এবং বংশী নাসিকা।

ত্বকচঞ্চুনাসিকা বুদ্ধি, প্রতিভা ও শক্তির প্রতীক। শক্তিমান পুরুষ, অতিমানব মূর্তি শুকচঞ্চুনাসিকায় নির্মিত হয়, রণচন্ডী দুর্গা, কালী, উগ্রচন্ডা ইত্যাদি মূর্তি।

তিলপুষ্পাকৃতি নাসিকায় নির্মিত হয় সরস্বতী, মহাদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি। বংশী নাসিকায় নির্মিত হয় শ্রীরাধা, সীতা, কৃষ্ণ ইত্যাদি।

যে সকল দেব-দেবীর রূপে কাম ভাব প্রকাশ পাবে তাদের ক্ষেত্রে বংশী নাসিকাই শ্রেয়।

নাসিকা নির্মাণের ক্ষেত্রে পুটম্ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। নাসিকার দুপাশে গোলাকৃতি যে মাংসপিন্ড থাকে তাকে বলে পুটম্। উত্তেজিত বা ক্রোধের প্রকাশ হলে পুটম্ দুটো প্রসারিত হয় বা স্থূলত্ব পায়। ঘৃণা, ক্রোধ, আনন্দ প্রকাশের জন্য সব ক্ষেত্রেই পুটমের প্রভাব রয়েছে।

চোখ বা চক্ষুঃ — চক্ষুকে শাস্ত্রকার কয়েকটি আকৃতিতে ভাগ করেছেন। যেমন মৎসাকৃতি,সফরি, কমল নয়ন, পটলচেরা, খঞ্জর নয়ন, পদ্মপলাশলোচন, মৃগক্ষ ইত্যাদি। সর্বোপরি শিল্পীকে মূর্তির মুদ্রা অনুযায়ী ভঙ্গীর সাথে সঙ্গতি রেখে চক্ষু নির্মাণ করতে বলেছেন।

ভ্রূঃ — চোখের ভাষার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে ভ্রূ-যুগলের। এই সম্পর্কে শাস্ত্রকার নিমপত্রাকৃতি, ধনুষাকৃতি - এই দুভাগে ভাগ করেছেন। দেব দেবীর মূর্তিতে ধনুষাকৃতি ভ্রূই শ্রেয়। তবে কোনও প্রয়োজনে ভীমাকৃতি মূর্তির ক্ষেত্রে নিমপত্রাকৃতি ভ্রূ করা যেতে পারে।

Contssamajpati@gmail.com

১৪১৪ তারাপীঠ মন্দিরের মুখপত্র তারালোকে প্রকাশিত

শিল্পীর মা কী চির সাথী?

শ্রী শ্যামল সমাজপতি

শুরুতেই বলি আমি শিল্পী (ভাস্কর), মাটি, কাঠ, পাথর ও ধাতু - এই জগৎটায় আমি খুব সহজেই বিচরণ করতে পারি, কিন্তু সাহিত্যে হোঁচট খাই। তারাপীঠ চিনলাম সম্ভবতঃ ২০০৪ - এর নভেম্বর মাস নাগাদ। দীপকদার সাথে কথায় কথায় ঠিক হল তারাপীঠ যাবো। ঐদিন রাতেই রওনা হলাম। গন্তব্যস্থান তারাপীঠ; রামপুরহাট ষ্টেশন থেকে অটোতে যখন তারাপীঠ পৌঁছলাম রাত দুটো নাগাদ। অটো স্ট্যান্ডে তখন কয়েকজন লোক থাকলেও একটু এগিয়ে যেতেই কুকুর ছাড়া কাউকেই রাস্তায় দেখা যায় না। মন্দির, শ্মশান কিছুই চিনি না, শীতের রাত, কুয়াশায় আচ্ছন্ন, দশ ফুট দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটু এগিয়ে যেতেই গাঁজার গন্ধ নাকে এল, তখনই বুঝলাম এদিকটাই শ্মশান। লোকজন কিছুই দেখছি না, কিছুটা এগিয়ে যেতেই আমি যেন ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। পিছন থেকে দীপকদা বলছে এখন ও দিকে না যাওয়ায় ভাল, জানি না চিনি না। আমি ওর কথা না শুনে এগিয়ে যাচ্ছি, তখন আমার মনে হচ্ছিল এই জায়গাটা আমার ভীষণ চেনা। কোন পরিচিত জায়গায় কিছুদিন পরে গেলে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম। কিন্তু কি দেখছি এখন গুছিয়ে বলতে পারবো না। আজও আমার কাছে এর কোন উত্তর নেই। কিছুক্ষণ শ্মশানের এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরির পর একটা বাজনা কানে এল, সেদিন জানতাম না ওটা মায়ের মন্দিরের স্নানের বাজনা। সকালে আলো ফুটেছে, দোকান খুলেছে, আমরা একটা দোকানে বসে চা বিস্কুট খাচ্ছি। ওখানে একজন লাল জামা ধুতি পরা পান্ডা এসে চা খাচ্ছিলেন, ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, এখানে কি খেয়ে পূজা দেওয়া যাবে? উনি হেসে বললেন, কেন দেওয়া যাবে না, এখানে তো ছেলেকে খাইয়ে তারপর মা খান। অতএব আপনি খেয়ে কি না খেয়ে পূজো দেবেন, ওটা আপনার মনের ব্যাপার। তবে এখানে কোন বিধিনিষেধ নেই। কথাটা আমার মনে ধরল।

পূজা দিয়ে সেবারের মত বাড়ি ফিরে এলাম, আমি ঠিক তৃপ্তি পাই নি কেন জানি না। আমি ঐদিন রাতে কি কি দেখলাম সেগুলোকে প্রাণপণ সাজাতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। সে এক বিশ্রি রকম মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছিল ক'দিন ধরে। এরপর মাস দুয়েক বাদে আবার তারাপীঠ গেলাম। সাথে আমার স্ত্রী মৌসুমী, দীপকদা এবং ওর স্ত্রী পুত্র। আমি সেই বার সকালে মন্দিরে না গিয়ে শ্মশানে বশিষ্ঠদেবের আসন, বামদেবের সমাধি এবং শিবাভোগ তলায় ধূপকাঠি মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রণাম করে মন্দিরে এসেছি এর মধ্যে দেখি ওরা পূজা দিয়ে বেরোচ্ছে। আমার মন্দিরে যাওয়া হল না, আমি নাট মন্দিরে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলাম। অথচ সেদিন যে আমার কি মানসিক তৃপ্তি হয়েছিল আমি বোঝাতে পারবো না।

ঐদিন রাত ৮টা নাগাদ আমার স্ত্রী আমাকে এসে বলল আসল মূর্তি দেখতে এগার টাকা দিতে হবে। আমি বলেছিলাম তুমি দেখ, আমার দেখার দরকার নেই। সত্যি কথা বলতে কি আমার খুব রাগ হয়েছিল, মনে হয়েছিল এটা কি লুভার মিউজিয়াম নাকি?

যাই হোক পরদিন সকাল এগারটা নাগাদ আমি একাই মন্দিরে গেছি, চন্দ্রচূড় মন্দিরের কাছে একটা দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের এখানে কি তারাপীঠ সম্পর্কিত কিছু বই-পত্র পাওয়া যাবে? এক ভদ্রলোক আমাকে একটা চটি বই দিলেন। বইটির দাম পাঁচ টাকা। হোটেলে এসে দুপুরে বইটা পড়লাম। আবার বিকেলে গেলাম ঐ দোকানে। তখন ওনাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই বইটা যিনি লিখেছেন তিনি থাকেন কোথায়? উনি হেসে বললেন, আমার নাম দেবাশীষ মুখার্জী। এভাবে ওনার সাথে আলাপ হল। কিছুক্ষণ কথায় কথায় আমি বললাম এখানে নাকি শিলামূর্ত্তি দেখতে হলে এগার টাকা দিতে হবে? উনি তখন আমার ভুল ভাবনাটা ঠিক করে দিলেন। তখনই আমার সম্পর্কে উনি জানলেন। আমি কি কাজ-কর্ম করি। আমাকে রাত্রি আটটা নাগাদ আসতে বললেন। গেলাম আটটা নাগাদ। উনি বললেন চলুন আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। ভাল করে দেখে আমাকে বলবেন। আমি রাজি হলাম, কিছুক্ষণ পর আমাকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। এখানেই হল বিপত্তি। আমার মনের সমস্ত অঙ্ক যেন গোলমাল হয়ে গেল। আমার চোখ এবং মন যে কি ধাক্কা খেল আমি একথা কাউকে কোনদিন বোঝাতে পারব না। সেদিন প্রথম আমি চর্মচক্ষু দিয়ে শিলামূর্ত্তি দেখে আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেখামাত্রই মনে হচ্ছিল এই মূর্ত্তি আমার ভীষণ চেনা মূর্ত্তি, কিন্তু কোথায় দেখেছি, এই ভাবনায় মনের মধ্যে উথাল-পাথাল করছিল। অত লোক মন্দিরের মধ্যে আমার সেটা নজরেই নেই। আমি ভাবছি আমি এখানে একা, আর

আছে ঐ মূর্ত্তি। এদিকে মন্দিরে যারা ঐ সময়ে থাকেন, মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য এবং প্রচলিত রীতি সম্পর্কে বলে চলেছেন। আমার কানে ঐসব কোন কথাই যেন ঢুকছে না। সকল দর্শনার্থী বেরিয়ে যাবার পর দেবাশীষবাবু আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন ভাল করে দেখুন। তখন আমার মনে হল আরে আমার তো ভাল করে দেখার কথা।

মুর্ত্তির চারদিকে ঘুরে দেখলাম। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে নারায়ণ মন্দিরের বারান্দায় বসে উনি আমাকেই জিজ্ঞাসা করবার আগেই ওনাকে বললাম, দেখুন এই মূর্ত্তি আমার চেনা। আবার নতুন করে দেখলাম। উনি সেদিন ব্যাপারটা বোঝেন নি। আমিও বোঝাতে পারি নি। (আমার এই অনুভূতির কথা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না জানি, কারণ এর কোন প্রমাণ নেই। (সাক্ষী রয়ে গেছে পরের কিছু ঘটনায়) উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মূর্ত্তিটা দেখলেন সেটা কি কোন মূর্ত্তির অংশ বিশেষ ? আমি সে দিন মজা করে বলেছিলাম এতদিন ধরে দেখেও আপনারা একে কারো অংশ ভাবছেন ? একেবারেই না, এটা একটা পূর্ণমাত্রার মূর্ত্তি, যে নিজের মহিমায় বসে রয়েছেন। কারো দয়ায় নয়। উনি আমাকে সেদিন বলেছিলেন আপনার ভাবনার সাথে আমার ভাবনা ভীষণ মিলে যাচ্ছে। এরপর দিন আমরা বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু মনের মধ্যে আরও কিছু প্রশ্ন এসে গেল। মূর্ত্তিটা কোথায় দেখেছি, আমি কোন মন্দির বা মিউজিয়ামে তো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আমার কাছে ভারতীয় ভাস্কর্য্য সম্পর্কিত যত বই আছে তার ছবি দেখা শুরু করলাম। গেলাম আর্ট কলেজে, ওখানকার লাইব্রেরিতে দেখলাম, না পেয়ে শেষে রামকৃষ্ণ মিশনের লাইব্রেরিতে আমি সেদিন ঐ বইপত্র ঘেঁটেছিলাম। কারণ হল অনেক সময়ে ছবি আগে দেখলাম পরে যখন মূর্ত্তি দেখছি সে ক্ষেত্রে এধরণের প্রতিফলন হতে পারে, এই ভেবে।

পেলাম না ওটা কিন্তু আমার মনের মধ্যে রয়ে গেল। বাড়ি এসে অর্ডারি কাজে বসে গেলাম। একটা পোট্রেট করছি (রাতেই আমি সাধারণতঃ কাজ করি)। মুখটা খুব কঠিন ছিল, ছবি দেখে করতে হচ্ছে, সেদিন রাতে এমন হচ্ছে যে ঠোঁট মিলছে তো চোখ মিলছে না, চোখ মিলছে তো চিবুক মিলছে না। একটু কাজ করি, আবার চেয়ারে বসে দেখি, এই করতে করতে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ঐ সময় ঐ মূর্ত্তিটা মনে হল আমার সামনে এসেছে, এরকম কয়েকবার দেখতে দেখতে তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। হাতে মাটি ছিল, একটা রেফারেন্স বানিয়ে রাখলাম পাছে ভুলে যায়, এই ভেবে। তারপরে ঐ পোট্রেট শেষ করলাম। কয়েকদিন বাদে বাড়িতে আমি একা রাতে খেয়ে-দেয়ে একটা বই নিয়ে বসেছি। কিছুক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরিয়েছি, তন্দ্রা এসে গেছে - তখন আবার ঐ মূর্ত্তি একইভাবে আমার সামনে আসছে আবার চলে যাচ্ছে, আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না। হঠাৎ সিগারেট শেষের দিকে এসে আমার হাতে ছ্যাঁকা লাগতেই তন্দ্রা ভেঙে গেল, আমি ঐ সময়ে একটু দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন গেলাম আমার শিল্প শিক্ষাগুরু ভাস্কর সুরজিৎ দাসের কাছে। ঐদিন ইচ্ছা করেই আমি ভারতীয় ভাস্কর্য্য বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ তুললাম, আলোচনার মাঝপথে এই বিষয়টা বললাম। উনি আমাকে বলেছিলেন যেটা মনে আছে দেখছিস ওটা মাটিতে করে রাখ, নয়তো ভুলে যাবি। আমি ওনাকে বলিনি যে আমি রেফারেন্স করে রেখেছি। আমি ওনার কথায় উৎসাহ পেলাম। বাড়িতে এসেই একটু বড় করে বানিয়ে ফেললাম। কয়েক সপ্তাহ বাদে একদিন দেবাশীষদা ফোন করলেন, উনি শিয়ালদহে প্রেসে ওনার বইটি ছাপতে দিয়েছেন সেখানে আসবেন, আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে ওনার বই-এর কভারটা একটু দেখে দিতে। আমি গেলাম প্রেসে, ওখানকার কাজ শেষ হবার পর বললাম আমার বাড়ি চলুন, এলেন আমার বাড়িতে। পরিচিতি সামান্য কয়েক দিনের মাত্র, তখন ভাবছি দেখাব কি দেখাব না, অনেক ভেবে চিন্তে দেখালাম, এবং ঘটনাগুলো বললাম। উনি দেখে বিশেষ কিছু মন্তব্য না করে বললেন মুদ্রাটা একটু সামান্য এধার ওধার হয়েছে; মোটিভ তো ঠিকই আছে।

এরপর হঠাৎ একদিন কি মনে হল যাই তারাপীঠ ঘুরে আসি। তখনই দেবাশীষদার সাথে ঐ মূর্ত্তির বিষয়ে কথা হয়। ওনার ইচ্ছা ছিল যে শিলা মূর্ত্তি কিভাবে ক্ষয়-এর হাত থেকে রক্ষা করা যায়। আমি ওনাকে বললাম, দেখুন আমি পাথরের মূর্ত্তি বানাতে পারি কিন্তু পাথর বিশেষজ্ঞ নই। আপনি জি. এস. আই. এর সাথে কথা বলুন, দরকার হলে আমি আপনাকে সাহায্য করব। সেদিনও আমি জানিনা কি কি জিনিস দিয়ে স্নান করান হয়। জানলাম যে কারণ (মদ), অগরু - এই দুটো স্নানে লাগবেই, এই কারণেই ক্ষয় হচ্ছে। আমি আবার শিলামূর্ত্তি ভালভাবে দেখেছিলাম। আলোচনা ঐ দিন এ পর্যন্তই হল। কিছুদিন বাদে উনি আমাকে ফোনে বললেন - আচ্ছা আপনি তো ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি বানান, তার ভিতরটাতো ফাঁকা থাকে, ঠিক ঐ রকমই একটা মূর্ত্তি করে শিলামূর্ত্তির উপর বসিয়ে দিলে কেমন হয় ? ভেবে দেখলাম জিনিসটা মন্দ হয় না। কয়েকদিন রাতে ফোনে আমাকে বললেন এ - কাজ আপনাকেই করতে হবে। আমি ভাবতে একটু সময় নিলাম। কিভাবে কি করব এই জন্য। এর মধ্যে একজন তান্ত্রিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হল উনি কালীপূজা করেন, ওনাকে বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করতে পারছি না। আমি ওনাকে ব্যাপারটা বলছি মাত্রই, উনি বলে উঠলেন আপনি কথা দিয়েছেন,

করেছেনটা কি? খবরদার ওসব করতে যাবেন না, ও তন্ত্রে দেবী সাংঘাতিক জিনিস, খুব সাবধান! ঠিক এই কথাগুলো বললেন। তখন আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছি না বলে দি, কিন্তু কি ভাবে বলব, যাই হোক ফোন করে বললাম অন্য কেউ যদি করে দেয় তাকে বলুন, আমার একটু ভয় লাগছে ঐ কাজ করতে, সেদিন ফোনে ওপার থেকে দেবাশীষদা বলেছিলেন আমার এখনো মনে আছে আপনার মায়ের জ্বর হল, আপনি ছোঁয়াচে বলে কি মাকে ছোঁবেন না? আপনি মূর্ত্তি করুন বা নাই করুন একবার আসুন।

কয়েক সপ্তাহ বাদে সস্ত্রীক গেলাম, সেদিন আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওনার দীক্ষাগুরু সত্য পান্ডার সঙ্গে। তিনি আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করলেন। আমি রাজি হলাম, ছবি চাইলাম, ছবি তোলা যাবে না। তাহলে কাজ করবো কিভাবে? ঠিক করলাম আমরা যেভাবে মানুষকে সামনে বসিয়ে মানুষের মূর্ত্তি তৈরী করি, ঐভাবে করব। কিন্তু ওতো দুই - এক ঘন্টার কাজ নয়, ঠিক হল ওনারা রাতে শিলামূর্ত্তি দর্শন শেষে মন্দির আমাকে কাজের জন্য ছেড়ে দেবেন সকাল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। রাজি হলাম। ১২-১২-২০০৬ রবিবার শুরু করলাম কাজ। মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই তা নয়। ঐ যে তান্ত্রিকের সাবধান বাণী আমার কানে তখনও বাজছে, তবে এখানে কয়েকটি ঘটনা বলা দরকার। প্রথমতঃ আর্থিক ব্যয়ভার কিভাবে বহন হবে? দেবাশীষদা ঠিক করেছিলেন সকল পান্ডাদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে করা হবে। সময় লাগবে। হঠাৎ আর. সি. অগ্রবাল নামে একজন তারাভক্ত এগিয়ে এলেন, সময় বাঁচল। এতো গেল ওদিককার ব্যাপার। এদিকে আমি থাকি যাদবপুরে, এখান থেকে সব জিনিস না নিয়ে ওখানে যেটা পাওয়া যাবে ওরা যোগাড় করে দেবে। সেই মত দেবাশীষদাকে ফোনে বলেছিলাম একটা কাঠ জোগাড় করে রাখবেন, ওর উপরে রেখে মূর্ত্তিটা বানাতে হবে। কিন্তু মাপ বলা হয় নি, সেই মত দেবাশীষদা কাঠমিস্ত্রিকে বলেছে, মিস্ত্রি তার মত কাঠ ওনার বাড়িতে রেখে গেছে। আমি যখন রাতে কাজ শুরু করবো, কাঠ চাইতেই দেবাশীষদা বাড়িতে গেলেন কাঠ আনতে। এদিকে আমার যে সহকারী ছিল খোকন দাস এবং বন্ধু প্রতিম শিবপ্রসাদ দে, এরা জিজ্ঞাসা করেছিল কাঠতো আনতে বললেন, মাপ বললেন না? তাইতো, এত বড় ভুল হয়ে গেছে, রাত্রি বাজে প্রায় দশটা, বড় ছোট হলে কি করবেন, কোথায় পাবেন? একটা দুশ্চিন্তা ঢুকল মাথায়। কয়েক মিনিট পরেই দেবাশীষদা কাঠ হাতে নিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন, মেপে দেখলাম আমার যে মাপের কাঠ দরকার একদম সেই মাপের কাঠই মিস্ত্রি রেখে গেছে। আমি আজও ঐ কাঠের টুকরো সযত্নে রেখে দিয়েছি, ওটা শিলামূর্ত্তির সঠিক মাপ। যাইহোক কাজ শুরু করলাম, তখন ও ঐ তান্ত্রিকের কথা কিন্তু ভুলতে পারছি না।

রাত যে কখন শেষ হল টের পেলাম না। এভাবে (১৪-১২-২০০৬) মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কাজ করলাম কলুর বলদের মত, বুধবার (১৫-১২-২০০৬) রাতে কাজ শুরু করবার আগে দেখেছিলাম কতদূর হল, কারণ সারাদিনে ওই (আমার বানানো মূর্ত্তি) মূর্ত্তির সামনে যাই না। সেদিন শিলামূর্ত্তির সাথে মিল পাচ্ছিলাম না, তখন ঐ তান্ত্রিকের কথা মনে পড়ে গেল। মনে মনে খুব ভয় হচ্ছিল যদি কাজটা ঠিক করতে না পারি, দুই একজন পান্ডা রাতে এসে দেখেন, তাদের মুখও বাংলার পাঁচ হয়ে থাকে, আমার বানানো মূর্ত্তি দেখে। কাজ করে চলেছি, আমাকে কাজটা ঠিক করতেই হবে, ভোর রাতের দিকে পালদা (মন্দিরের নৈশপ্রহরী) চা বানিয়ে ডাকলেন - শ্যামলদা চা হয়ে গেছে। চা খেতে বেরিয়েছি। আমার গেঞ্জি দেখি ভিজে গেছে ঘামে, বাইরের সকলে চাদর গায়ে কানে মাফলার জড়ানো, আমার প্রচন্ড গরম লাগছিল, চা এর কাপ নিয়ে মায়ের ঘাটের দিকে গিয়ে বসলাম। একটু সময় কাটিয়ে আবার মন্দিরে ঢুকলাম। এবার কিন্তু দেখছি প্রায় কাছাকাছি এসেছে, পরদিন সন্ধ্যায় আরতির সময়ে পিলারে হেলান দিয়ে বসে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেছি, আবার সেই শিলামূর্ত্তি আমার কাছে এসেছে। এদিকে আমি কিন্তু ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন দাদা, প্রসাদ নিন, বলে আমার হাতে সন্ধ্যা আরতির প্রসাদ দিয়ে চলে গেলেন।

বৃহস্পতিবার (১৬-১২-২০০৬) রাতে আবার কাজ শুরু করলাম। দুজন পান্ডা মূর্ত্তি দেখতে এসেছে (কম বয়সী), একজন মজা করে বলছিল, দাদা এই মূর্ত্তিটাকে যদি পাশে রেখে দিয়ে বলা যায় মায়ের শিলামূর্ত্তি দুটো হয়ে গেছে, কেমন হয়? ওরা মজা করছিল আমি শান্তি পেয়েছিলাম। ঐদিন কাজ শুরু করার সময় মোম কতটা আছে দেখছিলাম। দেখে ভয় হয়েছিল হয়ত কম পড়বে, কিন্তু কাজ শেষ করবার পর দেখলাম নামমাত্র মোম আমার হাতে রয়েছে, ঐ রাতে কাজ শেষ করলাম। বাকি রইল ফিনিশিং টাচ্ শুক্রবার (১৭-১২-২০০৬) সেদিন রাতে অনেক নিশ্চিন্ত মনে কাজ শুরু করে দেখলাম আমার হাতে যে মোমটুকু ছিল সেটুকুও লেগে গেল। সেই ছয় রাত কাজ করে ওদিকের কাজ শেষ করলাম। এরপর ব্রোঞ্জ (অষ্টধাতু) ঢালাই করবার জন্য যা করবার করে ঢালাই করলাম। এরপর দেখা গেল একদম অক্ষত ঢালাই হয়েছে, যা নাকি আমার জীবনে এই মুর্ত্তি বাদ দিয়ে আর একটা মূর্ত্তির ক্ষেত্রে হয়েছিল। পরে যখন ফিনিসিং করতে যাব দেখলাম পেছনের দিকের মাঝখানের অংশটা একটু বসে গেছে, বহুবার চেষ্টা করেও ঐ অংশটা সমান করা গেল না। (আমার সাথে যে ঢালাই

এর কাজ করেছিল তার নাম রাম)। রামের মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ও আমাকে বহুবার বলেছিল দাদা, ঐ অংশটা মোমে বানিয়ে ঢালাই করে ওয়েলডিং করে দিন। ওকে সেদিন আমি থামিয়ে রেখেছিলাম, ঠিক আছে পরে দেখা যাবে। আগে তো একে নিয়ে মন্দিরে যাই, তারপর যদি দরকার হয় গ্রাইন্ডার নিয়ে যাব, যেখানে আটকাবে সেই জায়গাটা কেটে দেবো। আমি সাহস করে বলেছিলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম ওখানে যদি গ্রাইন্ডার দিয়ে কাটার পর ফুটো হয়ে যায় ? ওয়েলডিং করাতো এক সমস্যা। এটা আমার মাথায় বিরাট চিন্তা ছিল। সেইমত কতগুলো যন্ত্রপাতি আমি নিয়ে গিয়েছিলাম, এটা রাম আর আমি ছাড়া কেউ জানে না। ওখানে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আমি মূর্ত্তি নিয়ে সোজা মন্দিরে চলে গেলাম, দেখলাম যে অংশটা বসে গিয়েছিল সেটা যদি সোজা হত তাহলে শিলামূর্ত্তির উপর আমার বানানো অষ্টধাতুর রেপ্লিকা ঠিকমত বসানো যেত না। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে আমি আমার চোখের জল সামলে রাখতে পারিনি। সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম আনন্দে। এই ঘটনা আমি কাউকেই বলিনি। জানে শুধু রাম। আজকে লিখতে বসে ঐ ঘটনা না লিখলে আমার অনুভূতির কথা সম্পূর্ণ হবে না। আমি সময় সুযোগ পেলে তারাপীঠ চলে যাই, কারণ মায়ের টান তো আছেই, আরো আছে সজ্জন, ধর্মপ্রাণ বন্ধুসম দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, অশোকদা, তাপসদা, প্রবোধদা, তপনদা (কেশব পান্ডা) পলাশদা, তারাময় মুখোপাধ্যায়, তারকদা, রবিদা। এছাড়া আরো একজন আমাকে প্রাণ ঢেলে আর্শীবাদ করেছিলেন। তারাপীঠে ওনাকে সবাই বড়মা বলে (প্রয়াত শম্ভুকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী)। এটা যে আমার কত বড় প্রাপ্তি সেটা বলে বোঝাতে পারব না।

আমি শহরে থাকি, এখানে সাধারণভাবে একটা প্রচলিত ধারণা রয়েছে তারাপীঠ মানেই মদ-গাঁজার স্বর্গ রাজ্য, আমি যদি এভাবে না দেখতাম তাহলে হয়ত আমার মনেও ঐ ধারণাটাই থেকে যেত। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের একটা কথা মনে পড়ে গেল - রাজহাঁসকে দুধ আর জল মিলিয়ে দিলে ও দুধটাকে খায়, জলটা পড়ে থাকে। তাই তারাপীঠের ভাল - মন্দ যাই থাক, আমার কাছে যেটা ভাল ''জয় তারা'' বলে সেটাই আমি নিলাম বাকিটা ফেলে দিলাম।

contssamajpati@gmail.com